# হুমায়ুন আহমেদ-এর নির্বাচিত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

**জামাল হোসেন**

**গবেষক**

বাংলা কথাসাহিত্যে হুমায়ুন আহমেদ এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা সাহিত্যে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। পরাধীন বাংলার নেত্রকোণা জেলার কুতুবপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ১৩ ই নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রথম ধাপে তিনি রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ ফুরফুরে মেজাজের যুবক ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে বাস্তব ভূমিতে নিয়ে আসে। একাত্তরের পর থেকে জীবিত কাল অব্দি তিনি ৩০০ টি রও বেশি রচনা সৃষ্টি করেছেন। হিমু, শুভ্র, মিসির আলী ইত্যাদি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্য ভান্ডার রবীন্দ্রনাথের পর এমন উপহার এই প্রথমবার পেয়েছিলো।

হুমায়ুন আহমেদ যৌবনের শুরুতে যখন কল্পনার প্রাচুর্যতা নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন ঠিক তখনই সমগ্র বাংলায় অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা চলছিলো। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের তাণ্ডব। কল্পনার আশ্রয়ে বেঁচে থাকা চঞ্চলমনা যুবকের স্বপ্ন তখন একটু একটু করে ধূলিসাৎ হতে থাকে, স্বপ্নগুলো ধুলিস্যাৎ হওয়ার পিছনে প্রধান একটি কারণ ছিলো পিতার মৃত্যু। শোষক শ্রেণির হাত থেকে নিজেকে আর পরিবারকে রক্ষা করতে হুমায়ুন আহমেদের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকেও তখন পলাতকের জীবন কাটাতে হয়। যে মানুষটি দুদিন আগেও কল্পনার মায়াজালে আবদ্ধ ছিলো সেই মানুষটি তখন বাস্তবের নির্মম পরিস্থিতির শিকার। চোখের সামনে তিনি দেখতে পান অসহায় দরিদ্র মানুষদের ধ্বংস হয়ে

যাওয়া। গ্রামকে গ্রাম নিউ সংস খুনিদের হাতে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সাধারণ নিরপরাধ মানুষদের এইভাবে মরতে দেখে হুমায়ুন আহমেদের যে একাত্তরের বাস্তব অভিজ্ঞতার অর্জন হয় তারই সুপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় তার সাহিত্যবিশ্বে। তিনি কল্পনামুখর জীবন থেকে বেরিয়ে বাস্তবের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। তিনি দেখতে পান একই ধর্মের মানুষ কীভাবে অনায়াসে দুই দলে ভাগ হয়ে যেতে পারে। তিনি দেখেন নিরস্ত্র সাধারণ বাঙালি নিজের অধিকার কায়েম করতে কিভাবে মরিয়া হয়ে উঠে। এগুলো ঔপন্যাসিককে পীড়িত করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শ্যামল ছায়া' –তে বাস্তব ঘটনাগুলোর প্রতিফলন ঘটে। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'শ্যামল ছায়া' –উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সাহিত্য জীবনের শুরুতে রচিত হলেও উপন্যাসটির গভীরতা অনেকটা উচু মানের। তিনি যে সাহিত্য ধারা বজায় রাখতেই সাহিত্যবিশ্বে উতরেছেন তা নয়। তিনি মৌলিক ও নিজস্ব ধারায় সাহিত্যজগতে অনন্য হয়ে উঠেছেন।

'শ্যামল ছায়া' উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি এত বেশি প্রসারিত নয়। উপন্যাসটির আত্মকথন রীতিতে উপন্যাসটি রচনা করেন। স্বল্প পরিসরে রচিত উপন্যাসটির মধ্যে জাফর, হুমায়ুন, আনিস ও মজিদ এই ছারজন মুক্তিযোদ্ধার কথা পাওয়া যায়।এরা প্রত্যেকেই গভীর রাতে নৌকা করে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে সফল করতে বেরিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বাজি পথপ্রদর্শক হাসান আলি। মেথিকান্দা থানা উচ্ছেদ এই অপারেশনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো। রাতের অন্ধকারে নৌপথে তাদের এই অভিযান পাঠকের মনে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। চার মুক্তিযুদ্ধার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও পাক আর্মির প্রতি তীব্র ক্ষোভ যাত্রাপথে প্রকাশ পায়। উপন্যাসের গতিপথ এই চার চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ 'শ্যামল ছায়া'উপন্যাসটি গতানুগতিক রীতিতে রচনা করেননি। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা বলতে তিনি আলাদা কোন চরিত্র

নির্মাণ করেননি। তাঁর ভাষায় বাংলার প্রতিটি যুদ্ধাই নায়ক। বাংলার প্রতিটি নারীই নায়িকা। তবে এদের কথা বর্ণনা করার জন্য তিনি উল্লেখিত চারটি চরিত্র অবলম্বন করেছেন। হুমায়ুন আহমেদ 'শ্যামল ছায়া'– উপন্যাসটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচনা করলেও রচনার মাধুর্যতা হারিয়ে যেতে দেননি। চার যুদ্ধার মধ্য দিয়ে কখনো কৌতুক, কখনো অলসতা, কখনো বা অন্যান্য মজার বিষয়গুলো উপস্থাপন করে গেছেন। যার ফলস্বরূপ উপন্যাস পঠনে একঘেয়েমি ক্ষণিকের জন্যও আসে না।

মুক্তিযুদ্ধ বাহিনী একসময় দেখেছিল মেথিকান্দা অপারেশন বারংবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যর্থতা তাদের তাই এক সময় বেপরোয়া করে তোলে। সকলেই প্রায় একসময় এই মেথিকান্দাকে 'মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ' হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। কিন্তু 'শ্যামল ছায়া' –র তরুণ চার যুবক এই নামটিকে চিরতরে ধুলিস্যাৎ করতে নাছোড়বান্দা হয়। দু: সাহসিক যুদ্ধযাত্রা তাই অচিরেই তাদের শুরু হয়। যাত্রাপথে তাদের গল্প-গুজবে আনন্দ-ফুর্তিতে বারবার উঠে আসছিল কিছু রোমহর্ষক যুদ্ধ চিত্র ও। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কমান্ডারের উক্তি :-

"মেথিকান্দায় প্রথম অপারেশনে গিয়েছি। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, একেবারে ফাঁকা ক্যাম্প। চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার আর গোটা পনেরো রাজাকার ছাড়া আর কেউ নেই। রাত দুটোয় অপারেশন শুরু হলো। আমি আর সতীশ গর্তের মতো একটি জায়গায় পজিশন নিয়েছি।

সতীশকে বললাম, শুরু কর দেখি, আল্লাহ ভরসা।আর তখনি মর্টারের গোলা এসে পড়ল। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি আমি আনিসের কাঁধে শুয়ে ! আনিস প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সবাই যখন পালিয়েছে, সে তখন জীবন তুচ্ছ করে খোঁজ নিতে এসেছে আমার। মেথিকান্দার সেই যুদ্ধে আমাদের চারজন ছেলে মারা গেল।"

মুক্তিযুদ্ধ 'শ্যামল ছায়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় এমন গুরুগম্ভীর হওয়া সত্বেও ঔপন্যাসিক কিন্তু উপন্যাসে অভিনবত্ব ঠিক বজায় রেখেছেন। তিনি সকল স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজাকার হতে দেননি। হাসান আলি, উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ এই চরিত্রটি যার নুন খেয়েছে তার কথা রাখতে গিয়ে বাধ্যতাবশত রাজাকারের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তর যার পবিত্র সে খারাপ কর্মে স্বাভাবিক নিয়মে সংযত থাকবেই। তাই অন্নদাতার আদেশ পালন করা তার পক্ষে সহজ বিষয় ছিলো না। হিন্দু প্রতিবেশীদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে সে অনবরত এই কারণেই বিবেক দংশন ভুগছে।

হাসান আলি উপন্যাসে নিজের শেকড়কে ধরে রেখেছিলেন। তিনি সমাজের কাছে যে রূপে ধরা দিয়েছিলেন বাস্তবে ছিলেন তারই বিপরীত। যাত্রাপথে হাসান আলির দীর্ঘসময় ধরে মনের মধ্যে চলছিল নানা তোলপাড়। সে সকলকে সুরক্ষিতভাবে লক্ষ্যস্থলে না পৌছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কোনভাবেই শান্তি পাচ্ছিল না। অবশেষে হাসান আলি সহ সকল মুক্তিযোদ্ধার দল ঠিকানায় পৌঁছায়। সেখানে অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করছিল মুক্তিযোদ্ধার আরেকদল।

লেখকের এই লোমহর্ষক বর্ণনাগুলো আসলে মুক্তিযুদ্ধের দলিল। এরকম নিখুঁত বর্ণনা তো কোনো পত্রিকা বা নিউজ চ্যানেলেও পাওয়া যায়নি বা যাবে না। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে পাওয়া যায় মুক্তিযোদ্ধাদের নানা চিঠি, উল্লেখযোগ্য মানুষদের সাক্ষাৎকার, অনেক শোষিতের জবানবন্দী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুঁটিনাটি বর্ণনা।